টান

(গল্পগ্রন্থ – অনুসন্ধান)

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা তাঁদের পরিবারবর্গ কর্মউপলক্ষে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেকদিন থেকেইবাস করছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিনবসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ি-পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ি দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়িটি চালাচ্চেন। অনেকদিন দেখিনিপ্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেছেন তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহান্তির বড়গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমস্‌ডেল'কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এইপথটা যেতে হল তো) প্রণববাবু ও আমি দু-জনে বসে গল্পকরছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকমহঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়িতে বলে আসি নি, স্নান হয় নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হলে থাকবেন তো, একটা খুব ভালো গল্প বলবো খেয়েদেয়ে, ওই বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন ?ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুরবাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কত দিন আর থাকবেন ?

—বুধবারে চলে যাব। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভালোহল। কতদিন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা নাজানাতেই—

—মাংস খান তো ?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর ?

—খুব।

মধ্যাহ্ন-ভোজন খুব ভালোই হল।

এরপর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনেপশ্চিম দিকেনদীর ওপারে শৈলশ্রেণি, ঝির-ঝির বাতাস বইচেনদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণিকে পেছনেফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছুকিছু সকালবেলা শুনেচেন। আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলব। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনারকাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগান্ডা রেলপথতৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমারবাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে। তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে Big hunter। লোহার মতো শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে, সে দেশের নেটিভদের মতোই।এসব কথা গল্পের মতো শোনাচ্ছে না কি ?কিন্তু ঘর-ভোলা লোকের কাছে এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানিবাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। আমাদেরপৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সেআমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্‌হ্রদের তীরবর্তীকামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেএকজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারি করতেন সে

সময়—আমাদেরপরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহকরেন নি, ছুটিছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমায় ইংরিজি পড়াবার ভারওনিয়েছিলেন।

সে সময় ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কপি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালি পরিবার ছিল। সকলেই উগান্ডা রেলপথের কর্মচারী।আর একজন ছিল খ্রিস্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি একমিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো, মাঝেমাঝে দূর পল্লিঅঞ্চলে চলে যেত।

আমি পনেরো বছর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলামবাবা-মার সঙ্গে। ওখানকার জীবন খুব ভালোই কেটেছিল।জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতোভাই অতুল এসে বেলজিয়াম কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবিআমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে।বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজকরবো, হাতি সিংহ শিকার করব, গল্পের বইয়ের নায়কের মতোদুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার পূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দের আস্বাদ করব।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত ?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া ?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজিপড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেমের কাছেঅঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালোবাসতেন ডসন সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ারগাননিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম।শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদেরদু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কন্টকও সিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখির দলবিচরণ করতো, এখনো করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহেরসামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল।সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালেতিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিল। সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনা করে ?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অতবছর বয়সেডাক্তারি পড়লেন?পাসকরেছিলেন?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরেরকোর্স ছিল তখন ?তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনোকরছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথমে প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশি রোজগার করি, সবইডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল সেখানে যাই, কিন্তুসেখানে আর সুবিধে হবে না। ম্যালান গভর্নমেন্টের আওতায়ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতীয়দের আরসেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশি ডাকতো।

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়েবিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণকরেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হল খুব ভালো। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হল না। আমার খাওয়ারনাকি খুবই কষ্ট হল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রবণবাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হলেআমার মামার বাড়ির ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার।আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময়ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউন্টেন্টের কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁরবড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর। আমার মা তাঁর শেষ বয়সেরসন্তান, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলেএক পুরনো ঝি, আমার মামারবাড়ির। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছিল।বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু পিছু যেতো মার বড়বয়েসেও।

বামা কোথাও যেত না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্রগ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সেকখনো আর সে গ্রামেও পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়িএসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ি চলে আসে এবংমাঝে মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাইবাড়িএসেই থাকত।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা ?

সে বলত—না খেদি (মার ডাকনাম), জামাই-বাড়ি কিথাকতে আছে ?লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারত না— কিছুদিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতেভালোবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধু হাতে কখনোআসে নি।

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামারবাড়িতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আরচোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন ?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাতবছর বয়েস।

—তারপর ?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা-মা উগান্ডা চলে গেলেনএবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমেবড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হল। আমার এক বোনের বিয়ে হল মোম্বাসায়, সেখানেহুগলী জেলার বন্দীপুরেররামতারণ চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানির অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মামারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদরোগেকষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতেকরতে বললেন, শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন,ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতেলোকজন যোগাড় হল। যে কটি বাঙালি পরিবার নাইরোবিতেসে সময় থাকত, তাদের সকলের বাড়ি থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ি খবর পেয়ে। রাতএগারটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড়নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ-সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশি। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড়-একটামড়া নিয়ে যেতে সাহস করত না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জ্বেলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদেরদল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েছে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমারছোট ভাই দেবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখ, ও কেদাদা ?

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টেচিতার দিকে চেয়ে আছে। পরনে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ ! ও যে বামাঝি !

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মতো দেখতেবটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে ?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশানভূমিতে কোনোবাঙালির মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্যকিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর একতত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার ?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্যকরে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জ্বলন্তচিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমারমনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহেরটানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশানভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয়মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুমসবাই মিলে। তারপরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশি কিছু কথা বলি নি এরপর। দাহকার্য শেষকরতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ি ফিরেএলুম, তখন বেলা সাতটা সাড়ে-সাতটা।ওইনদীতীরেই আমারমার দশপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশদিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণকরেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবিরবাঙালিদের বাড়ির মোটামুটি বিয়ে পৈতে ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে ‘পুরুত-কাকা’।

নদীর এপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।